‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এর ঐতিহ্যিক কাঠামো ও ঐতিহাসিক পুনর্গঠন

ভীষ্মদেব চৌধুরী*

প্রথানুগ সমালোচনায় এবং বিদ্যায়তনের পরীক্ষামুখী পঠন-পাঠনে ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ (শ্রাবণ ১৩০২) গল্পটিকে অতিপ্রাকৃত অভিধায় চিহ্নিত করে আলোচনার ঐতিহ্য সুদীর্ঘকালের। তবে, বাংলা সাহিত্যসমালোচনার সনাতনী-ধারার অন্যতম পুরুষ প্রমথনাথ বিশী বিস্ময়করভাবেই ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এর অতিপ্রাকৃতিকতা প্রসঙ্গটি নাকচ করে দিয়েছিলেন।[১] *গল্পগুচ্ছকে* গীতধর্মী অভিহিত করে সমকালীন আলোচনার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবত একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ *গল্পগুচ্ছের* প্রাথমিক পর্বের রচনায় গীতধর্মিতার স্থলে বাস্তবিক অভিজ্ঞতার কর্তৃত্ব দাবি করেও একটি সংশয়ী বাক্যে ‘কঙ্কাল’ ও ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পে গীতধর্ম ও কল্পনা-প্রবণতার অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় : ‘গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে। ‘কঙ্কাল’ কি ‘ক্ষুধিত পাষাণ’কে হয়তো খানিকটা বলতে পারো, কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্য, কিন্তু তাও পুরোপুরি নয়।’[২] কল্পনাশক্তি ও বাস্তবতাবোধ পরস্পর-বিপরীত দুই মানস প্রবণতা হিসেবে স্বীকৃত হলেও সৃষ্টিশীল সাহিত্যে কখনও কখনও বাস্তবতাকে বেষ্টন করে কল্পনা পল্লবিত হয়, আবার এমন দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয় – যেখানে বাস্তবাশ্রিত প্রসঙ্গও কল্পনার বর্ণবিভায় জীবনশিল্পের বিচিত্রিত ক্যানভাস সৃজনে সক্ষম। ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পে এক অমোঘ প্রক্রিয়ায় পরস্পর-তৃষিত বাস্তবতা ও কল্পনা অন্তর্লীন হয়ে এমন এক অভূতপূর্ব অভিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে যা গল্পটি প্রসঙ্গে আবেগবিস্ময়মুগ্ধ সনাতন আলোচনা-বিবেচনার বনেদি ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে। ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ যে প্রাকৃত-অতিক্রমী কোন শিল্পকৃতি নয়, ঐতিহাসিক বাস্তবতার ওপর এক সৃজনক্ষম কবিসত্তার বর্ণযোজনার অভিপ্রয়াস, এক পুনর্গঠিত ইতিহাসের নন্দনশোভা – বর্তমান নিবন্ধ এই প্রত্যয় প্রমাণেরই প্রচেষ্টা।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গল্পটিতে একটি ঐতিহ্যিক কাঠামোর আশ্রয়ে এক অনন্য ঐতিহাসিক পুনর্গঠন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর অপূর্বত্ব ও অনন্যতার উৎস ঐ আশ্রয় ও প্রক্রিয়ার আভ্যন্তর রহস্যলোক থেকেই অনুসন্ধান করে নিতে হবে।

২

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প সংগঠিত হয়েছে স্বতন্ত্র দুটি গল্পের সমন্বয়ে[৩]; একটি ফ্রেম-গল্প, অন্যটি মৌল-গল্প। অনেকটা গল্পের ভেতরে প্রবিষ্ট গল্পের মতই মৌলগল্পটি সুবিন্যস্ত। উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ-রচিত আরও দুটি গল্পে এ-ধরনের নির্মাণকৌশল অনুসৃত হয়েছে সত্য[৪], কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ অনুসৃত এই কৌশল গল্পের স্বরভঙ্গি ও প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠায় পালন করেছে মূল্যবান ভূমিকা। গল্পোক্ত দুই উত্তমপুরুষের প্রথম কথক, যিনি গল্পকারের প্রতিরূপ হিসেবে পরিকল্পিত, – তাঁর উপস্থাপিত গৌরচন্দ্রিকা এবং 'ভেতর-গল্পে'র আকস্মিক অবসানের প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত উপসংহার প্রস্তুত করেছে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের রসাবেদনের ভিত্তি। গল্পটি অবলম্বন করে বহুকথিত অতিপ্রাকৃত-রস প্রসঙ্গীয় তর্ক-বিতর্কের নিরাকরণেও সূচনা ও সমাপ্তির এই পরিকাঠামোর গুরুত্ব সর্বাধিক।

গল্পটি শুরু হয়েছে প্রথম উত্তমপুরুষের আত্মভাষ্য বর্ণনায়। পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ শেষে কলকাতায় প্রত্যাগমনকালে কথক ও তার আত্মীয়র সঙ্গে রেলগাড়িতে সাক্ষাৎ ঘটে দ্বিতীয় গল্পোক্ত 'বাবুটি'র। মৌলগল্প বা ভেতর-গল্পে এই 'বাবুটি'ই অবতীর্ণ হয়েছেন কথকের ভূমিকায়। বাবু-র সঙ্গে বাংলা পদাশ্রিত-নির্দেশক 'টি' যুক্ত হওয়া মাত্র এই 'বাবু' গল্পকারের বিশেষ অভিপ্রায়ের দ্যোতক হয়ে ওঠেন। বাবু-পদাশ্রিত এই নির্দেশকটি যে এখানে সম্মানার্থ-বর্জিত বিস্ময় ও অবজ্ঞার বার্তাবহ তা সহজেই অনুধাবনযোগ্য। গল্পকথকও কোন দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টির অবকাশ না-রেখেই তাঁর উপলব্ধির অকপট ভাষ্য রচনা করেছেন এভাবে : 'তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথা শুনিয়া আরও ধাঁধা লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন।' স্বভাবতই এই 'নব-পরিচিত' 'আলাপীটি'র 'রকম-সকম' দেখে অবাক না-হওয়ার উপায় ছিল না। সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শীর ভূমিকায় আবির্ভূত এই ব্যক্তির ইংরেজি ও পার্সি ভাষাজ্ঞান, বেদ ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অসামান্য অবহিতিতে তাঁর প্রতি পরিব্রাজক বন্ধুযুগলের 'ভক্তি' উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার শ্লেষসঞ্চারী তথ্যও গল্পকথক সংযোজন করে দেন। এবং 'বাবুটি'র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সহযাত্রী আত্মীয়র সঙ্গে

ইতোমধ্যে তাঁর মানস-ব্যবধান সূচিত হওয়ার কথাও তিনি সুকৌশলে জানিয়ে দিয়ে বলেন : 'আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীর সহিত কোন-এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু-একটা যোগ আছে–কোন-একটা অপূর্ব ম্যাগনেটিজ্ম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন। আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছু খুশি হইয়াছিলেন।' উপর্যুক্ত তথ্যজ্ঞাপক পটভূমি যোজনার পরেই রাত সাড়ে দশটায় দ্বিতীয় গাড়ির দীর্ঘ অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত সহযাত্রীদের উদ্দেশে 'সেই অসামান্য ব্যক্তিটি' যে 'গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন' তা-ই 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মৌলগল্প। এবং বলাই বাহুল্য যে, প্রথম কথকের মনোভঙ্গি থেকে প্রযুক্ত গল্প ফাঁদার বিষয়টি গল্পটির বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নমুখী করে তুলেছে তীব্রভাবে। তবে দ্বিতীয় উত্তমপুরুষ গল্পকথন শুরু করা মাত্র প্রথম উত্তমপুরুষ শ্রোতায় পরিণত হলেও ফ্রেমগল্পের বৃত্তটি পূর্ণতা পেয়েছে গল্পের শেষ তিনটি অনুচ্ছেদে। কথক কর্তৃক বিবৃত গল্পের ভেতরে আর একটি সম্পূরক গল্প পুনর্স্থাপনের ভূমিকা রচনার অব্যবহিত-পর মুহূর্তে যখন খবর পাওয়া গেল যে, বিলম্বিত গাড়িটি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করছে, তখন কথকতায় স্বভাবতই ছেদ পড়ে এবং গল্পোক্ত প্রথম উত্তমপুরুষ কথকের ভূমিকায় পুনরায় ফিরে আসেন। 'বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।' – এই মন্তব্যটি যোজনা করে যদিও প্রথমে তিনি এক নতুনতর কৌতূহল বিস্তার করেন তবু গল্পের শেষ দুই সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে ঐ-কৌতূহলকেই আবার এক প্রত্যয়দৃঢ় উপলব্ধিলোকে উত্তীর্ণ করে দেন। অনুচ্ছেদ দুটি অনুধাবনীয় :

'আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল; গল্পটা আগাগোড়া বানানো। এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিস্ট্ এই আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।'

ফ্রেমগল্পের এই পূর্ণায়ত পরিকাঠামোই 'ক্ষুধিত পাষাণে'র পরিণামী রসাবেদনের ভিত্তি। মৌল-গল্পোক্ত বিমিশ্র বাস্তবতা যা কথকের সৃজনক্ষম কল্পনার আশ্রয়ে হয়ে উঠেছে অতিপ্রাকৃতিকতাস্পর্শী, সেই কর্মোদ্দীপনাহীন কল্পনাশ্রয়ী জীবনের প্রতি গল্পকার রবীন্দ্রনাথের না-বাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন এই পরিকাঠামোর মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে। মৌলগল্পের উন্মাদ-চরিত্র মেহের আলির চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গিটিই প্রতিরূপকায়িত হয়েছে।

৩

দ্বিতীয় গল্পকথক 'বাবুটি' আত্মভাষ্যে যে গল্প বিবৃত করেছেন তার কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনি নিজে। জুনাগড় রাজ্যের কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি যখন হাইদ্রাবাদে নিজাম-সরকারের চাকুরি গ্রহণ করলেন, 'অল্পবয়স্ক ও মজবুত' লোক দেখে তখন তাকে বরীচে তুলার মাশুল-আদায়ের কাজে নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। বরীচ স্থানটি অত্যন্ত রমণীয়। নির্জন পাহাড়ের সমতলে 'উপলমুখরিত পথে' 'নিপুণা-নর্তকীর' বঙ্কিম নৃত্যভঙ্গিমায় প্রবাহিত শুস্তা নদীর ধারেই 'দেড়শত সোপানময় ঘাটের উপরে একটি শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ শৈলমূলে দাঁড়াইয়া আছে – নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।' গল্প বিবৃত করার কাল থেকে আড়াই শত বছর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য নির্জন স্থানে নির্মাণ করেছিলেন এই প্রাসাদ। আড়াইশ বছরের ব্যবধানে এই বিলাসভবনটি আজ মোগল হেরেমের ঐশ্বর্যময় ভোগবাসনার স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। গল্পকথক 'বাবুটি'র ভাষায় 'এখন ইহা আমাদের মতো নির্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান।' গল্পটির সংগঠন-স্বাতন্ত্র্যের নিয়ামক-চরিত্র 'আপিসের বৃদ্ধ কেরানি' করিম খাঁ অবশ্য প্রাসাদটিতে বাস না করার জন্য তুলার মাশুল-কালেক্টরকে নিষেধ করেছিল বারবার। বলেছিল ইচ্ছে হলে দিনে থাকবেন কিন্তু রাত্রিবাস করবেন না কখনও। গল্পকথকের গল্পবলার শেষ পর্যায়ে যখন তৃতীয় উত্তমপুরুষরূপে অসমাপ্ত এক গল্পের অবতরণিকা নিয়ে করিম খাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটেছে তখন সূচনার সতর্ক-সংকেতের সঙ্গে পরিণতির কথিত জনশ্রুতির কার্যকারণ গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে। ক্ষুধার্ত পাষাণের অন্ধকারে নিমজ্জমান তুলার মাশুল-কালেক্টর যখন মেহের আলির সংকেতবহ ধ্রুব-সংলাপকে উপলক্ষ করে আত্ম-উদ্ধারের চেষ্টায় করিম খাঁর কাছে প্রাসাদের নৈশকালীন রহস্যের অর্থ জানতে চেয়েছে তখন করিম খাঁ গল্পকথককে যা বলেছে, প্রথম-উত্তমপুরুষের ভাষ্যে তার মর্মার্থ এ-রকম : 'এক-সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত – সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।' বলা আবশ্যক করিম খাঁ কথিত এই জনশ্রুতিই গল্পটির অতিপ্রাকৃত-পরিচয় নির্ধারণে প্রণোদনা জুগিয়েছে প্রথানুগ সমালোচনায়। নতুন একটি অসমাপ্ত গল্পের অবতরণিকা হিসেবে

কথিত এই জনশ্রুতিটিকেই 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের ঐতিহ্যিক গঠনশৈলীর কৌশল হিসেবে গ্রহণ করলে মৌল গল্পান্তর্গত নির্মীয়মান বাস্তবতা, যাকে বর্তমান নিবন্ধে নিকট-অতীতের লুপ্ত বা অলিখিত ইতিহাসের পুনর্গঠনরূপে অভিহিত করা হবে, তার যাথার্থ্য, কার্যকারণ শৃঙ্খলা ও বাস্তববাদিতা অনুধাবন সহজতর হবে। অর্থাৎ, এখানে এই অভিমত ব্যক্ত করা যাচ্ছে যে, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের মৌল আধেয়টি গড়ে উঠেছে এক স্বাপ্নিক অথচ ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু প্রাজ্ঞ যুবকের ইতিহাস-পুনরুদ্ধারের স্বপ্নবিহ্বল বর্ণাঢ্য অভিযাত্রায়। ইতিহাসের জগতে পরিভ্রমণের এই অভিযাত্রায় গল্পকার অতিপ্রাকৃত অনুষঙ্গকে আবহমূল্য দান করেছেন মাত্র। যদি যুক্তির পরম্পরা অনুসরণ করে তুলার মাশুল-কালেক্টরের জাগর-চৈতন্য ও স্বপ্নযাত্রার ভেদরেখা চিহ্নিত করা যায় তাহলে 'রাত ও দিনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের' মতই ইতিহাসনিষ্ঠ ব্যক্তিটির দ্বৈত চেতনাস্রোতের স্বরূপটি শনাক্ত করা দুরূহ হবে না। দিনের বেলাকার কর্মময়তায় জগৎ ও জীবন, তুলার মাশুল-কালেক্টরের কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য, জীবন্ত ও বাস্তব। কিন্তু অলস কর্মহীনতায় অন্ধকার নৈশ-প্রকৃতিতে প্রাসাদ-অভ্যন্তরের স্বপ্নজগৎ আপাত অলীক, ভঙ্গুর এবং স্বপ্নবাস্তবতামণ্ডিত। পুনরুল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, এই স্বপ্নবাস্তবতা অলিখিত ইতিহাসের অনুষঙ্গ অনুসরণ করেই অঙ্গীকার করেছে নির্মিতব্য এক ভিন্নমাত্রিক বাস্তবতাকে। গল্পের ভেতরকার ঘটনাস্রোত ও চেতনাতন্তুজালের রহস্যমোচনের মাধ্যমেই প্রস্তাবিত এই প্রতিবেদনের নিরাকরণ সম্ভব।

৪

বর্তমান নিবন্ধে– 'আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল।' – তুলার মাশুল-কালেক্টরের সজ্ঞানপ্রসূত এই আত্মভাষণকে গল্পটির কথিত অতিপ্রাকৃত-বিষয়ক রহস্যমোচনের নির্ণায়ক-বাক্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। দিবারাত্রির উল্লিখিত দ্বন্দ্বই রূপকার্থিক ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ হয়ে গল্পটির 'ক্ষুধিত পাষাণ' নামকরণে হয়েছে প্রতিভাসিত। দিন ও রাতের মধ্যকার এই দ্বন্দ্বের রূপক কোন্ ভিন্ন তাৎপর্যের দিকে ইশারা নিবদ্ধ করেছে, তার নিরাকরণ জরুরি। স্মরণীয় যে, *মানসী* থেকে *সোনারতরীতে* উত্তরণের সময়পর্বে রবীন্দ্র-মনোলোক যখন আত্মসংঘর্ষে লিপ্ত, 'ক্ষুধিত পাষাণ' সেই কালেরই সৃষ্টি। *মানসী*-পর্বে 'নিষ্ফল কামনা', 'প্রকৃতির প্রতি', 'হৃদয়ের ধন', 'বিচ্ছেদ', 'সুরদাসের প্রার্থনা' প্রভৃতি কবিতায় রূপ-অরূপের দ্বন্দ্বদীর্ণ রবীন্দ্রমানস 'অসীমের সীমা' রচনায় ব্যাপৃত ছিল। ধরণীর অসীমতা আর চকিত তমসার 'ঘোর অন্তরাল'-এর বিপরীতে অন্তহীন স্বপ্নের কথা অভিব্যঞ্জিত হয়েছে

'বিচ্ছেদ' কবিতার শেষ স্তবকে : 'নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন –/ সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল।/ নয়নের দৃষ্টি গেল – রহিল স্বপন,/ অনন্ত আকাশ আর ধরণী বিশাল।' এই দেহাতীত-রূপাতীত প্রেমের জগৎ থেকে রূপময় প্রেমের জগতে উত্তরণের শিল্পগাথাই চিত্রময় হয়েছে *সোনারতরীর* কবিতায়-কবিতায়। তবে এই উত্তরণের উৎসে রবীন্দ্র-অন্তঃকরণের সংঘাতের ইতিহাস জড়িত। *সোনারতরীর* 'দুই পাখি', 'পরশপাথর', 'আকাশের চাঁদ' প্রভৃতি কবিতায় ঐ আত্মসংঘাত ও দ্বন্দ্বমুক্তি রূপান্বিত হয়েছে। দেহী-বিদেহী রূপ-অরূপ সীমা-অসীমের উল্লিখিত দ্বন্দ্বই অভিন্ন সময়পর্বে রচিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে দিবারাত্রির দ্বন্দ্বের প্রতিরূপকে শিল্পিত হয়েছে। এবং কবিতার মতো গল্পের ক্ষেত্রেও পরিণতিতে দ্বন্দ্বমুক্তির নিগূঢ় শিল্পকথা প্রতিভাসিত হয়েছে।

এবারে বর্তমান পরিচ্ছেদের সূচনায় উল্লেখিত 'নির্ণায়ক-বাক্য'টির দিকে মনোনিবেশ করলে লক্ষ করা যাবে যে, মাশুল-কালেক্টর যখন ঐতিহাসিক প্রাসাদটিতে বসবাস করতে শুরু করেন তখন 'অবিশ্রাম কাজকর্মের' শেষে ক্লান্তিহর সুখনিদ্রায় তার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। বরঞ্চ 'পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা' 'ভয়ংকর ভারের মতো' তাকে চেপে রাখতো। এই 'বিজনতা' এবং 'ভয়ংকর ভার'ই সপ্তাহখানেকের ব্যবধানে 'এক অপূর্ব নেশায়' রূপান্তরিত হয়ে আক্রমণোদ্যত হয়ে ওঠে। সংশয়সূচক অব্যয়-সহযোগে সৃজিত একটি অসামান্য চিত্রকল্পে ঐ মানসিক অবস্থাকে কথক বিবৃত করেছেন এভাবে : 'সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।' চিত্রকল্পে উত্তীর্ণ এই উৎপ্রেক্ষায় প্রাসাদটির উপমান-অন্বেষণে একটি অজগরের প্রতিমা মূর্ত হয়ে উঠেছে।[৫] কিন্তু 'গ্রীষ্মকালের আরম্ভে তুলার বাজার যখন 'নরম', তখন মাশুল-কালেক্টরের অফুরন্ত অবসর। এই অবসরের প্রশস্ত পথ ধরেই প্রথমে আবছায়া এবং পরে ঘনান্ধকার বিজন রাত্রির নিস্তব্ধতায় ইতিহাস-অনিসন্ধিৎসু কল্পনাপ্রবণ যুবকের স্বপ্ন-অভিযাত্রার সূত্রপাত। 'সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।' – চিত্রকল্পবিস্তারী এই ইন্দ্রিয়ঘন প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিকায় উন্মোচিত হয়েছে গল্পের নাটকীয় রহস্যের পর্দা। পশ্চিম আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো পাহাড়ের কারণে সূর্যাস্তের সময়ে আলো-আঁধারের সম্মিলনকাল বরীচে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, সন্ধ্যা অতিদ্রুত রাতের দিকে এগিয়ে আসে। প্রকৃতিস্বভাবের এই বস্তুগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ঘনায়মান সন্ধ্যার পরিপ্রেক্ষণীতে দ্বিধান্বিত নায়ক সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পান কিন্তু পেছন ফিরে দেখেন কেউ নেই। চেতনার দ্বৈতাবস্থার অর্থাৎ যুগপৎ সজ্জান ও নির্জ্ঞান

চৈতন্যের সহাবস্থানমূলক এক অনন্যব্যতিক্রমী চিত্রগীতময় কথকতায় এ-পর্যায়ের বর্ণনাংশ ঋদ্ধ। একদা মধ্যযুগের মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অনেকটা বিস্ময়করভাবেই তাঁর স্বর্গভ্রষ্ট নায়ক কালকেতুর সুপ্তি ও জাগর চৈতন্যের যুগল-অবস্থাকে প্রতিভাসিত করতে গিয়ে লিখেছিলেন 'এক চক্ষে নিদ্রা যাই এক চক্ষে জাগি।' তুলার মাশুল কালেক্টরের জাগর ও স্বপ্নচৈতন্যের প্রায় অনুরূপ অবস্থাই লক্ষ করি দ্বিতীয় গল্পকথকের অভিনব ইতিহাস-অভিযাত্রার প্রস্তুতিপর্বে। দৃষ্টান্ত অনুধাবনীয় :

'যদিও আমার সম্মুখে কোনো মূর্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শতধারার মতো সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল।... তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য।...

...বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল, ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না; মনে হইল, ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই শোনা যাইবে – কিন্তু একান্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়।'

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে সংশয়সূচক 'যেন' অব্যয়-এর সাহায্যে শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের, দৃশ্য ও অদৃশ্যমানতার, স্থির ও অস্থিরতার এবং শ্রুতি ও অশ্রুতির প্রবল বৈপরীত্য এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যাতে চেতনার দুটি সমান্তরাল রেখা সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যে বিভাজিত হয়ে যায়। এটি সহজেই অনুধাবনযোগ্য যে, 'এক চক্ষে নিদ্রা' এবং 'এক চক্ষে জাগা' যেমন বাস্তবে অসম্ভব, ঠিক তেমনি অভিন্ন সময় ও পরিবেশে ব্যক্তিক-চেতনার এই বিভাজন গল্পকারের রচনাকৌশলেরই অনিবার্য আয়ুধ। গল্পটি প্রসঙ্গে 'অতিপ্রাকৃত' অভিধার সারবত্তাহীনতার প্রমাণ হিসেবেও উল্লিখিত রচনাংশ উদাহৃত হতে পারে। উদ্ধৃত-অংশের শেষ বাক্যে কথক স্পষ্টতই বলেছেন যে, 'একান্তমনে' কান পাতলে অতিপ্রাকৃতজ শ্রুতিধারার স্থলে অরণ্যের প্রাকৃত ঝিল্লিরবই কেবল শোনা যায়। কিন্তু তবু আর 'এক চক্ষে'র 'নিদ্রা'-স্নাত স্বপ্নাবেশে আড়াইশ বছর আগেকার দোদুল্যমান 'কৃষ্ণ-যবনিকা' অলিখিত-ইতিহাসের নাট্যমঞ্চে তাকে আকর্ষণ করে। – 'মনে হইল,...ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি – সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।' জাগরচৈতন্যে মাশুল-কালেক্টরের মনে হয় নির্জনতার অবকাশে 'সর্বনাশিনী' কবিতাদেবী বুঝি তার ঘাড়ে ভর করেছেন। এই মানস-অবস্থার জন্য শূন্য উদর এবং

অলস মস্তিষ্কের আনুকূল্যই যে দায়ভাগী এমন বিশ্বাসও তার মনে জাগে। ফলত পাচক ডেকে 'প্রচুরঘৃতপক্ব মসলা-সুগন্ধি' সহযোগে 'মোগলাই খানা' তৈরির হুকুম করেন তিনি। আর এভাবেই যোগ্য ইন্ধন পেয়ে ক্রমে ক্রমে অবারিত হয় 'মোগলাই ইতিহাসের' অবজ্ঞাত জগৎ পুনর্সৃষ্টির অবকাশ। দিনের বেলা মাশুল-কালেক্টরের কাছে যা হাস্যকর বলে মনে হয় রাতের বেলার স্বপ্নপ্রবাহে তা-ই বাস্তব হয়ে ওঠে। পরের দিন সন্ধ্যার আভাসমাত্র এক অদৃশ্য সম্মোহনশক্তি তাকে আকর্ষণ করে প্রাসাদ-অভ্যন্তরের রহস্যময় অলৌকিক জগতে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন প্রদীপ জ্বালানো হয়নি তখন দ্বার ঠেলে বৃহৎ ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই ঘরের মধ্যে ঘটে যায় বিরাট আলোড়ন; মনে হয় যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করে দ্রুত কেউ কোন দিকে পালিয়ে গেল ঠিকানাহীন। ফিরে পাওয়া মুহূর্তের সম্বিতে কিছু দেখতে না পেয়ে বিস্মিত নায়ক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে পরক্ষণেই নির্জ্ঞান স্মৃতিসত্তায় সঞ্চিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সচকিত করে 'বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ' প্রবেশ করে তার নাসারন্ধ্রে। ফোয়ারার ঝর্ঝর ধ্বনি, সেতারের অবোধ্য সুরধারা, স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিনী, নূপুর নিক্কন, তাম্রঘণ্টার প্রহরধ্বনি, দূরাগত নহবতের আলাপ, ঝাড়বাতির ঠুনঠুন শব্দ, বুলবুলির গান আর বাইরের বাগান থেকে আসা সারসের ডাকের ঐকতান মাশুল-কালেক্টরের মগ্নচৈতন্যে সৃষ্টি করে প্রেতলোকের রোমাঞ্চকর রাগিণী। তার কাছে মনে হয় 'এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর-সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা।' – কিন্তু প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প্ হাতে ভৃত্যের ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটে; বাস্তবচৈতন্যে পুনর্জাগত হয়ে সুনির্দিষ্ট আত্মপরিচয়টি তৎক্ষণাৎ স্মরণ হয়। এবং স্বপ্নার্জিত এই অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার সত্যাসত্য যে 'মহাকবি ও কবিবর'দেরই বক্তব্য-বিষয়, এই উপলব্ধি জন্মে। পূর্বের ভ্রান্ত মোহের কথা স্মরণ করে সকৌতুকে হাসতে হাসতে খবরের কাগজ পাঠের বাস্তবিক দৈনন্দিনতায় মনোনিবেশ করেন তিনি। তবু এই বাস্তবতার জগতে অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয় না, পরক্ষণেই ইতিহাসের জগতে পরিভ্রমণের সম্পূরক মোগলাই খাবার তিনি আহার করেন। অতঃপর প্রদীপ নিবিয়ে শয়ন করেন বিছানায়। আহার-প্রক্রিয়ার আনুকূল্য আর আলোকশূন্যতার বস্তুগত পরিপ্রেক্ষিতের যুগলমিলনে পুনরায় অবারিত হয় স্বপ্নপ্রবাহের ইতিহাস-অভিযাত্রা। শয্যাগ্রহণের শুরুতে কোটি যোজন দূরের আকাশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র নিবিড়ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাশুল-কালেক্টরের। নক্ষত্রের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। আবার সহসা শিউরে উঠে যখন জেগে ওঠেন তখন 'অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসংকুচিতভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।' যদিও কোন লোকেই

তার দৃষ্টির পরিসীমায় ছিল না, তবু তার মনে হয় কে একজন যেন তাকে আস্তে আস্তে ঠেলছে। 'অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে' সে যেন তাকে অনুসরণ করার আদেশ করে। 'যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময়, প্রকাণ্ডশূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি ও সজাগ প্রতিধ্বনিময় বৃহৎ প্রাসাদে' মাশুল-কালেক্টর ছাড়া আর কোন জনপ্রাণী ছিল না তবু 'সংযতপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে' সম্মোহিত মাশুল-কালেক্টর সেই 'অদৃশ্য আহ্বানরূপিণী'কেই অনুসরণ করে চলেন। মোগল হেরেমের ঐশ্বর্যগর্বী ভোগবিলাসের অলিখিত ইতিহাস এই প্রাসাদকে কেন্দ্র করে মাশুল-কালেক্টরের ইতিহাস-অনিসন্ধিৎসু সংবেদনাকে পূর্বেই উজ্জীবিত করেছিল। শ্রুতি-স্মৃতি-অধ্যয়ন-কল্পনার রসায়নে তার নির্জ্জান চেতনাস্তরে সঞ্চিত স্বোপার্জিত ইতিহাসচেতনা এবার ক্রমে ক্রমে যোগ্য ইন্ধন আর পারিবেশিক আনুকূল্যে ইতিহাসাশ্রয়ী পুনর্গঠন-প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃত হয়। ফলত যে 'আহ্বানরূপিণী' অদৃশ্য থেকেও চেতনাসাপেক্ষে সুপ্রত্যক্ষ, তারই অবয়ব এবং প্রতিমা-পরিকল্পনায় তিনি ইতিহাস-উৎসের অভিযাত্রী হয়ে ওঠেন। তার আত্মভাষ্য বর্ণনাটি অনুধাবনীয় : 'আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই তথাপি তাহার মূর্তি আমার অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রস্তরচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।'[৬] অন্তর্লোকে এই আরব-রমণীর প্রতিমা-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই মানস-অভিযাত্রিক মাশুল-কালেক্টরের মনে হয়েছে– 'আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগ্‌দাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোন-এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।' – আর এভাবেই মানস-পরিভ্রমণরত মাশুল-কালেক্টর স্বপ্নাবস্থায় উত্তীর্ণ হন অবজ্ঞাত অলিখিত মোগল-ইতিহাসের 'অপূর্ব' ত্রাতা-নায়ক রূপে; যাকে উদ্ধার করতে হবে কামনার পঙ্কে নিমজ্জিত ধর্ষিতা নারীদের, মানুষ কেনাবেচার হাট থেকে বিক্রীত হয়ে যারা মোগল-হেরেমের অতল-অন্ধকারের বন্দিনী। ফলত তাকে আর 'বিলাতি খাটো কোর্তা' আর 'আঁট প্যান্ট্‌লুনে' মানাতো না, মাথায় 'লাল মখমলের ফেজ' তুলে 'ঢিলা পায়জামা, ফুল-কাটা কাবা এবং রেশমের চোগা' পরে এবং আতর-মাখানো রঙিন রুমাল হাতে 'অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত' 'অপূর্ব ব্যক্তির' বা নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হত। ক্ষুধিত প্রাসাদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে 'ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে' মুক্তিপিপাসিনী অবরুদ্ধা নায়িকা মাশুল-কালেক্টরের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হত; তার 'জাফরান রঙের পায়জামা', 'শুভ্ররক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটি', 'বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি', সোনার ঝালর দেওয়া মাথার 'লাল টুপি' তাকে উন্মাতাল ক'রে 'প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপুরীর

মধ্যে' অভিসারে অংশগ্রহণে আকৃষ্ট করত। মাশুল-কালেক্টরের ভাষায় : 'অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।'[৭] কখনও 'বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি' বর্ষণ ক'রে, কখনও অন্ধকার গোরের ভেতর থেকে উত্থিত বক্ষ বিদীর্ণ করা কান্নার ধ্বনি বিস্তার ক'রে, কখনও বা বন্দিত্ব থেকে মুক্তির ব্যাকুল আহাজারিতে নায়কের মানসচৈতন্যে নায়িকাটি জীবন্ময় হয়ে ওঠে। – 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও – কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।' – একদিন অর্ধরাত্রে শ্রুত এই হৃদয়চেরা আহ্বান মাশুল-কালেক্টরের নির্জ্ঞানচৈতন্যে যে অভিঘাত সৃষ্টি করে, সজ্ঞানে তা-ই তাকে অলিখিত এক করুণ ধারাবাহিক ইতিহাস পুনর্গঠনে প্রাণিত করে। কিন্তু অনন্যোপায় এই নায়ক 'ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য' থেকে এই 'মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে' কীভাবে উদ্ধার করবেন? – তার এই আত্মজিজ্ঞাসাই অলিখিত এক ধারাবাহিক ইতিহাস পুনর্গঠনকে অনিবার্য করে তোলে :

'তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন্ বেদুয়িন দস্যু, বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কী ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার। দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেনশা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাব্‌শি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে!'

এর পরের রাতে সম্মোহিত মাশুল-কালেক্টর ক্ষুধিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে পুনরায় প্রবেশ করলে ওপর থেকে তার কপালে দু'ফোটা অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ে। নির্জ্ঞানে প্রত্যয়ীভূত 'অশ্রুজল' সত্য হলেও সজ্ঞান কথক এ-তথ্য জানাতে ভোলেন না যে, 'সেদিন অরালী পর্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল।' এই রাতে অচরিতার্থ-অতৃপ্ত জীবনের সেই বন্দিনী কামনাসুন্দরী নায়কের মনোবিশ্বে পুনরাবির্ভূত হয়ে অলিখিত ইতিহাসের রেখাচিত্রকে পূর্ণায়ত মহিমায় প্রতিষ্ঠা করে। ঘরের ভেতরকার 'নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে' প্রবিষ্ট নায়ক এবার সুস্পষ্ট অনুভব করলেন– 'একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়বদ্ধমুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনও সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও ফুলিয়া-ফুলিয়া ফাটিয়া-ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।' উল্লেখ্য যে, উভয় রাতের উপরোল্লিখিত ঘটনা দুটিরই নাটকীয় পরিসমাপ্তি ঘটেছে পাগলা মেহের আলির 'তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়' এই তাৎপর্যবহ সতর্কবাণী যোজনার মধ্য দিয়ে। একাধারে, লোকশ্রুত এই অতিপ্রাকৃত জগৎ থেকে প্রথম বেরিয়ে আসার প্রতীকী মূল্যের ধারক এবং ভোরের আলোর বার্তাবাহক মেহের আলি চরিত্রের যোজনায় গল্পকারের বিশেষ অভিপ্রায়প্রসূত শিল্পকৌশল-রহস্য গল্পটির সংগঠনশৈলী বিবেচনাকালে ব্যাখ্যাত হবে। তার পূর্বে আলোচিত প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতায় নিঃসন্দেহে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করা যায় যে, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের মৌল আধেয়টি অতিপ্রাকৃত আবহে বিন্যস্ত হলেও গল্পটি প্রাকৃত-অতিক্রমী কোনো শিল্পনির্মিতি নয়, বরঞ্চ নিবিড় ও প্রবলভাবে হয়ে উঠেছে করুণাকাতর এক পুনর্গঠিত-ইতিহাসের জীবনময় শিল্পকৃতি।

৫

বর্তমান আলোচনার প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে, 'ক্ষুধিত পাষাণে' রয়েছে গল্পের ভেতরে গল্প; একটি ফ্রেমগল্প, অন্যটি মৌলগল্প। ক্ষুধিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে সংঘটিত চেতনাসাপেক্ষ মনোবাস্তবিক বিষয়াবলিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে মৌলগল্পের কথা ও ভাববস্তু। আর মৌলগল্পটিকে উপস্থাপনার কৌশল হিসেবে গৃহীত হয়েছে বহির্কাঠামোধর্মী ফ্রেমগল্পের গৌরচন্দ্রিকা ও উপসংহার। ফলত, এই

জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের এই কাঠামো-পরিকল্পনায় ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের প্রাতিস্বিক উদ্ভাবনাশক্তি সক্রিয় কি না। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বিশ্ব-ছোটগল্পের উদ্ভবযুগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেশক'টি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। উদ্ভবযুগ অর্থাৎ উনিশ শতকে রচিত এ-সব গল্প মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই পর্যায়ের গল্পে কাব্যাবেগ ও 'চিত্রগীতিময়তার' প্রতি তিনি যতটুকু আন্তরিক, গল্পের আঙ্গিক-পরিকল্পনায় ততটুকু আগ্রহী নন। তবে এ সময়পর্বেই তিনি উত্তমপুরুষের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে কিছু অসামান্য গল্প সৃজন করেছেন, যাতে তাঁর রূপদক্ষ প্রজ্ঞার স্বাক্ষর বর্তমান। কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে উত্তমপুরুষের দ্বৈত-ব্যবহারের মধ্যেই এর সাংগঠনিক কৃতী সীমাবদ্ধ থাকেনি, সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে কাঠামোগত আদর্শ সংগ্রহ করে তিনি গল্পটিকে এক অসামান্য রূপাবয়বে পুনর্বিন্যাস করেছেন। 'আলিফ্ লয়লা ওয়া লয়লা' বা 'সহস্র এক রজনী'[৮] – যা বিশ্বসাহিত্যে 'আরব্য উপন্যাস' নামে সমধিক খ্যাত, তার বৃহৎ কাঠামোরই এক অণু-রূপ (mini form) 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে অবলম্বিত হয়েছে।

ফলত এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠবে যে গল্পের অবয়ব সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হলেন কেন? অখণ্ড গল্পগুচ্ছে গল্পের আঙ্গিক-পরিকল্পনায় সাহিত্যিক-ঐতিহ্যের আশ্রয়-প্রার্থনার অন্য কোন দৃষ্টান্ত নেই। তবে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প রচনার পূর্বাপর সময়বৃত্তে *আরব্য-উপন্যাসের* কল্পলোক রবীন্দ্র-চেতনায় একটি অন্যতম প্রেরণা-উৎসরূপে সক্রিয় ছিল। প্রমাণ হিসেবে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে রচিত 'পোস্টমাস্টার' গল্পে *আরব্য-উপন্যাস* প্রসঙ্গ উল্লেখিত হওয়ার কথা এবং ১৩০২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে লেখা 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পে আলিফ্ লয়লা তুল্য যাদুকরী কল্পলোক প্রতিষ্ঠার কথা বলা যায়। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে কষ্টকল্পিত কবিতানির্মাণ-প্রয়াসী প্রবাসী-নায়কের অন্তর্জগৎ উন্মোচনে সর্বজ্ঞ গল্পকার পাঠককে জানিয়ে দেন যে, 'কখনো কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমনভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায় – কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব- সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।'

'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর আঙ্গিক-পরিকল্পনা ব্যতিক্রমী শিল্পকৃতি নিঃসন্দেহে। তবে এই ব্যতিক্রমতা কেবল এর অঙ্গ-সংস্থাপনাতেই সীমায়িত নয়, বিষয়ের অভিনবত্বও

'ক্ষুধিত পাষাণে'র অনন্যতার গুরুত্বপূর্ণ প্রান্ত। সচেতন পাঠকের প্রসঙ্গত 'দালিয়া', 'রীতিমত নভেল' কিংবা 'দুরাশা' গল্পের কথা মনে পড়তে পারে, যেখানে গল্পের বিষয় ও পরিপ্রেক্ষিত সংগৃহীত হয়েছে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ইতিহাস থেকে। বিশেষত 'দালিয়া' গল্পের আখ্যান মোগল-ইতিহাসেরই সম্পূরক অংশ থেকে গৃহীত। তবে ঐ গল্পে অলিখিত ইতিহাস-পুনর্গঠনের প্রয়াস নেই গল্পকারের, ইতিহাসের অনুষঙ্গে রোম্যান্সের ছোটগাল্পিক জগৎ প্রতিষ্ঠাতেই অধিকতর আন্তরিক তিনি। এছাড়া উপরোল্লিখিত তিনটি গল্পেরই অঙ্গ-সংস্থাপনা প্রথানুগ। অতএব 'ক্ষুধিত পাষাণে'র আঙ্গিক-পরিকল্পনা সমগ্র গল্পগুচ্ছে অনন্য ব্যতিক্রম হিসেবেই বিবেচিত হবে।

প্রসঙ্গত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে 'আরব্য উপন্যাসে'র কাঠামো ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। গল্পটির বিষয়গত ব্যাখ্যায় একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মোগল-সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য-ইতিহাসের অভ্যন্তরে সঞ্চিত করুণ অচরিতার্থ জীবনেতিহাসের পুনর্নির্মাণ ছিল গল্পকারের অন্বিষ্ট। এই পুনর্গঠন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই মোগল-হেরেমের ভোগ্যপণ্যা বন্দিনী নারীমণ্ডলীর বিষাদগভীর পরিণতির উৎস ও ধারা নির্দেশনায় গল্পকার আরব-মরুভূমির যাযাবর নারীর বেদুয়িন দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হয়ে পারস্যের দাসী কেনাবেচার হাট ঘুরে মোগল-হেরেমে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ইতিকথাকে সর্বাধিক মূল্য দিয়েছেন। কাজেই গল্পে-বিধৃত বিষয়ও, আঙ্গিক-পরিকল্পনায় 'আরব্য-উপন্যাস'-এর অণু-রূপ গ্রহণে আনুকূল্য দান করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে *আরব্য-উপন্যাসের* আখ্যান-বর্ণনাকৌশল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।[৯] এমনকি রবীন্দ্রোত্তর বাংলাসাহিত্যের রূপকাশ্রয়ী একটি উপন্যাসেও আরব্য-উপন্যাসীয় কাঠামো অনুসৃত হতে দেখি।[১০] তবে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর গুরুত্বপূর্ণ 'মৌলগল্প'ই কেবল 'আরব্য-উপন্যাসে'র আঙ্গিক গ্রহণের একমাত্র কারণ, এমনটি ভাবার কারণ নেই। বরঞ্চ মনে হয়, রাত্রির পটভূমিকায় পরিকল্পিত 'আরব্য-উপন্যাসে'র অতিমানবিক জগৎ-জীবনের সঙ্গে বিমিশ্র বাস্তবতার মিশ্রণজাত রোম্যান্সময়তাই অতিপ্রাকৃত রাত্রির (লয়লা) পরিপ্রেক্ষণীতে রচিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের কাঠামো-পরিকল্পনার প্রধান প্রেরণা-উৎস। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্প্রতি প্রকাশিত 'আরব্যোপন্যাসের জগৎ ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিকচেতনার 'অবয়ব সৃষ্টিতে' অন্যতম প্রভাবক হিসেবে আরব্য-উপন্যাসের ভূমিকা চিহ্নিত করেছেন।[১১]

৬

সংস্কৃত *কথাসরিৎ-সাগর* -এর কাঠামো-পরিকল্পনায় গল্পের ভেতরে গল্প এবং তার ভেতরে আরও গল্প যুক্ত করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বিত হওয়ার দৃষ্টান্ত রসজ্ঞ পাঠকমাত্রই জ্ঞাত। *জাতক*-এর কাহিনী, সংক্ষেপিত *পঞ্চতন্ত্র*, এমনকি শিবদাস কিংবা জম্ভল দত্ত রচিত *বেতাল-পঞ্চবিংশতি*-র কাহিনীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় আখ্যানসাহিত্যের কোষগ্রন্থ *কথাসরিৎ-সাগর*। এতদসত্ত্বেও 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আঙ্গিক-পরিকল্পনায় মৌলিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও কথাসরিৎ-সাগর নয়, *আলিফ্ লয়লা ওয়া* লয়লা-র কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পের আভ্যন্তর সাক্ষ্য প্রসঙ্গত পুনরুদ্ধৃতিযোগ্য :

১. 'আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগ্‌দাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো-এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।'

২. 'এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের এক রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল – কিন্তু এখনও এক সহস্র রজনী বাকি আছে।'

আলিফ্ লয়লা ওয়া লয়লা-র সহস্র এক রজনীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে উজিরকন্যা শাহরাজাদীর মৌখিক ভাষ্যে। শসন বংশের পরাক্রমশালী ও ব্যভিচারী সম্রাট বাদশাহ শারিয়ার-এর উদ্দেশে কথিত শাহরাজাদীর সহস্র এক রাত্রির গল্প নিয়েই 'প্রেম, লালসা, ধর্ম, ঐশ্বর্য, স্বপ্ন, অ্যাড্‌ভেঞ্চার, জিন-মরিদ-ইফ্রিতের এক অপূর্ব জগৎ'[১২] – 'আরব্য-উপন্যাস'। শাহরাজাদীর সহস্র এক রাত্রব্যাপী রহস্যমণ্ডিত আপাত অনিঃশেষ এই গল্প-কথন-কৌশল অবলম্বনের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল উদ্যতখুনী ও কামনারাক্ষস বাদশাহ্ শারিয়ার-এর কবল থেকে মুক্তির প্রত্যয়ী আকাঙ্ক্ষা। তবে, কেবল শাহরাজাদী কিংবা তার অনুজা দুনিয়াজাদীর মুক্তির বাসনাই সহস্র এক রাত্রি পরিব্যাপ্ত কথামালার অনন্যমূল হেতু নয়, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বাদশাহের বিকৃত ভোগপিপাসার শিকার শত শত নিহত যুবতীর অচরিতার্থ জীবনের আর্ত-হাহাকার ও হতাশ্বাস এবং কথিত সহস্র এক রাত্রির সম্ভাব্য সহস্র এক যুবতী, যাদের অনাঘ্রাত কুসুমের মতো পবিত্র জীবন-যৌবন কামনা ও রক্তপিপাসার পঙ্কে অনিবার্যভাবে সমাচ্ছন্ন হতো,– তাদের জীবনমুক্তির জয়গান। 'আরব্য- উপন্যাসে' সহস্র এক রাত্রির শেষে রাজ্যের সহস্র এক কুমারী এবং শাহরাজাদী ও দুনিয়াজাদীর আনন্দময় নবজীবনই শুধু নিশ্চিত হয়নি, বাদশাহ শারিয়ারের ঔরসজাত শাহরাজাদীর

তিন শিশুপুত্রের কলহাস্যমুখরিত প্রতীকী অভিব্যঞ্জনায় বাদশাহের নবজন্ম ও কল্যাণী ভবিষ্যৎ-এর চিরায়ত আবেদন যুগপৎ অভিব্যক্তি পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের আঙ্গিক-পরিকল্পনায় 'আরব্য-উপন্যাস'-এর অণু-রূপ গ্রহণে দৃঢ়নিশ্চিত হয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন। ছোটগল্পের স্বল্পায়তন পরিসরে সহস্র এক রাত্রির সুদীর্ঘ গল্পবলার কাঠামোকে মাত্র কয়েকটি রাতের রহস্যমণ্ডিত ঘটনাধারায় বিন্যাস করার ক্ষেত্রে গল্পকার এক গল্পের ভেতরে আর এক গল্প অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়ার এবং একটি গল্পের শেষে আর একটি গল্পের অনিবার্য সম্ভাবনার কৌশলকে মান্য করেই ঘটনাক্রমের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং অপরিমেয় অনিঃশেষ রহস্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন। আরব্য-উপন্যাসোক্ত শাহরাজাদী, দুনিয়াজাদী এবং রাজ্যের সহস্র এক কুমারী যুবতীর বন্দিত্ব-মুক্তির মতোই আলোচ্য গল্পেও অলিখিত ইতিহাসের ছিন্নমূল অচরিতার্থ নারীদের মুক্তিবাসনা এবং প্রতীকী-চরিত্র পাগলা মেহের আলি ও গল্পের অনামা নায়ক মাশুল-কালেক্টরের রহস্য-আচ্ছাদিত মুক্তির ব্যঞ্জনা গল্পসমাপ্তির পরেও অপার বিস্ময়ের এক প্রশস্ত ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে রাখে।

৭

বর্তমান আলোচনার উপান্তে, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের তৃতীয় উত্তমপুরুষ করিম খাঁ এবং বিশেষ বাণীবহ প্রতীকী-চরিত্র পাগলা মেহের আলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে, বিতর্কসম্ভব জেনেও, একটি দূরাশ্রয়ী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্বাস উপস্থাপিত হলো। করিম খাঁ চরিত্রটি মৌলগল্পের সূচনাংশে অফিস কর্মচারীর সীমাবদ্ধ পরিচয়ে আবদ্ধ ছিল, সতর্কতাবাহী কিছু তথ্য উপস্থাপনাতেই ছিল তার ভূমিকা। কিন্তু মৌলগল্পের শেষাংশে সে তৃতীয় উত্তমপুরুষের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে এক অসমাপ্ত গল্পের গৌরচন্দ্রিকা উপস্থাপন করেছে, যা গল্পের ভেতরে গল্প বয়নের এবং ধারাবাহিকভাবে এক গল্প থেকে আর এক গল্পে প্রবেশের আরব্য-উপন্যাসীয় কৌশলকে ধারণ করেছে। গল্পটির গঠনশৈলীর বিশিষ্টতার অনুষঙ্গে করিম খাঁ চরিত্রের গুরুত্ব এখানেই। পাগলা মেহের আলি চরিত্রের পরিচয় করিম খাঁর বাচনিক তথ্যেই গল্পের নায়ক প্রথমে অবগত হন।

পূর্বে এ-কথা ব্যক্ত হয়েছে যে, বিমিশ্র বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষণীতে প্রতিফলিত কর্মোদ্দীপনাহীন কল্পনাশ্রয়ী ও অতিপ্রাকৃতিকতাস্পর্শী জীবনের প্রতি না-বাচক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূল কাঠামো হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে

'আরব্য-উপন্যাস'-এর আঙ্গিক বেছে নিয়েছিলেন। আর আপাত এই অবাস্তবতার অভ্যন্তরে নিহিত জীবনের স্বাভাবিকতা ও সুস্থতার প্রতি বিশ্বাসের যে বোধ পরিণামে গল্পে স্থায়ী ভাববস্তুর মূল্যে অভিষিক্ত হয়েছে, তার বাণীবাহক চরিত্রই পাগলা মেহের আলি। স্বভাবতই এ-প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, 'তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়' –জীবন সম্পর্কিত এই গুরুগম্ভীর উচ্চারণের বাণীকণ্ঠরূপে একটি উন্মাদ চরিত্রকে গ্রহণ করায় কোন নান্দনিক মনস্তত্ত্ব গল্পকারের চৈতন্যে সক্রিয় ছিল কি না? এই জিজ্ঞাসার নিরাকরণ প্রত্যাশাতেই মেহের আলির চরিত্র-পরিকল্পনার রহস্য অনুসন্ধান আবশ্যক। এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, গল্পের অতিপ্রাকৃত পরিপ্রেক্ষণী ও প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি উন্মাদ চরিত্রকে বাণীকণ্ঠের মর্যাদা দান করে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিরূপক তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তার রসাবেদনটি আয়রনিক্যাল। আর এই আয়রনিক রসাবেদন সঞ্চারের আদর্শটি সম্ভবত তিনি গ্রহণ করেছেন উইলিয়ম শেক্সপীয়র-এর কমেডি *টেমিং অব্ দ্য শ্রু* থেকে।

'মুখরা রমণী বশীকরণের'[১৩] মধ্যযুগীয় অমানবিক যে-সব কৌশল ঐ-নাটকটিতে ধারণ করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে কমেডির অনুকূল আপাতস্থূল হাস্যরসের সহায়ক। বাপ্তিস্তা-তনয়া ক্যাথেরিনাকে কেন্দ্র করে পেট্রিশীয়র অবলম্বিত কৌশলসমূহ মধ্যযুগীয় হাস্যবিস্তারী স্থূলতার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ-কথাও বিস্মৃত হলে চলবে না যে, স্থূলতর এক ব্যক্তি, মদ্যপ ক্রিস্টোফার স্লাই-এর মনোর নের জন্যই একটি নাট্যদল ধূর্ত নারী বশীভূত করার কৌশলবহ এই নাটক মঞ্চায়ন করেছিল। উইলিয়ম শেক্সপীয়র যে-ভাবে একজন মদ্যপের মনোরঞ্জনের যথোপযুক্ত উপায় শনাক্ত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি অতিপ্রাকৃত আবহে বিস্তারিত বিমিশ্র-বাস্তব ও কল্পনাশ্রয়ী স্বপ্নযাত্রার গল্পে গুরুগম্ভীর বাণীকণ্ঠ হিসেবে বেছে নিয়েছেন এক ব্যতিক্রমী উন্মাদ চরিত্র মেহের আলিকে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' সৃজনকালে রবীন্দ্রনাথ যে শেক্সপীয়র রচনাবলি নিবিড়ভাবে পাঠ করেছিলেন তার জলজ্যান্ত সাক্ষ্য আলোচ্য গল্পাভ্যন্তরেই লভ্য। মৌলগল্পের কথক 'বাবুটি'র সর্বসম্প্রতিবেত্তা পরিচয়কে সুদৃঢ় করতেই গল্পকার তার ভাষ্যে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক-নায়ক হ্যামলেট-এর একটি সুবিখ্যাত সংলাপের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ স্বীকৃতি-নিরপেক্ষভাবেই যুক্ত করে দিয়েছেন।[১৪] কাজেই 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পরচনার সময় সজ্ঞানে অথবা নির্জ্ঞানে *টেমিং অব্ দ্য শ্রু*-র বিশেষ চরিত্র-পরিকল্পনা ও রচনাকৌশল রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল এমন অনুমানে উদ্বুদ্ধ হতে বাধা থাকে না।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. দ্র. প্রমথনাথ বিশী; *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প,* নবম মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪৮০, পৃ. ৭৯

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; 'সাহিত্য, গান ও ছবি', প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮

৩. দ্বিতীয় গল্পের শেষাংশে করিম খাঁ নামক চরিত্রের ভাষ্যে উপস্থাপিত তৃতীয় আর একটি গল্পের সূত্রপাত হয়েছিল কিন্তু সে-গল্প সূচনামাত্রই অসমাপ্ত থেকেছে। এই অর্থে তৃতীয় একজন গল্পকথক তথা উত্তমপুরুষ-এর অস্তিত্ব গল্পটিতে লভ্য।

৪. উনিশ শতকে রচিত আরও যে-দুটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ গল্পের ভেতরে গল্প ধারণ করার কৌশল গ্রহণ করেছিলেন সে-দুটি হল : 'কঙ্কাল', 'নিশীথে'।

৫. এই প্রতিমারই দুটি সম্পূরক চিত্রকল্প পুনর্সৃষ্টি হয়েছে কথিত গল্পের অন্ত্যমধ্য ও প্রাক্-অন্তিম পর্বে, মাশুল-কালেক্টর পাগলা মেহের আলিকে উপলক্ষ ক'রে। দৃষ্টান্ত:

ক 'অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।'

খ. 'সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল।'

৬. এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শেষ-জীবনে রচিত 'ল্যাবরেটরি' গল্পের পাঞ্জাবি নারী সোহিনীর কটিবন্ধে বাঁধা ছুরির প্রসঙ্গটি সতর্ক পাঠকের স্মৃতিকে হয়ত সহসা সচকিত করবে।

৭. উদ্ধৃতাংশটিতে অজগরের একটি প্রতিমা সৃজিত হয়েছে। এর সম্পূরক একাধিক প্রতিমা গল্পটিতে লভ্য।

৮. কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সম্প্রতি প্রকাশিত 'অস্তিত্বের কথামালা' নামের প্রবন্ধে এই আখ্যানমালার শিরোনামা নিয়ে একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন : ' "আলিফ লায়লা-ওয়া লায়লা"। এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায়(?) "একটি রজনী এবং (আরও) রজনী।" তাহলে একে সহস্র এক রজনী কেন বলা হয়? আলিফ শব্দের মান বা সংখ্যা ১। লায়লা মানে রাত্রি। এখন সহস্র রজনী যদি বইটির নাম হয় তাহলে আরবিতে তা হওয়া উচিত ছিল 'আল্ফ্ লায়লা উয়া আলিফ লায়লা'। আল্ফ্ মানে এক হাজার। অথচ নামটি আলিফ লায়লা উয়া লায়লা। এই নাম নিয়ে কেউ চিন্তাভাবনা করেছেন কিনা জানি না তবে আমার সাধারণ জ্ঞানে মনে হয়েছে আখ্যানমালার নাম একটি রজনী এবং আরও রজনী হওয়ার দৃঢ় ভিত্তি আছে। যে রজনীতে শাহারজাদি গল্প শোনাতে শুরু করেছিল, আমার বিবেচনায় সেই রজনীটি ছিল শাহরাজাদির জীবনে এক সংকটকাল। তাই হয়ত এই আখ্যানমালার সংকলক সেই বিশেষ রজনীটিকে আগে চিহ্নিত করা দরকার মনে করেছিলেন 'আলিফ লায়লা' নামে।' – *এবং মুশায়েরা,* আরব্য রজনী বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ৪৭

৯. সংস্কৃত *কথাসরিৎসাগর*-এর অন্তর্গত *জাতক*, *বেতালপঞ্চবিংশতি*, *পঞ্চতন্ত্র* এবং হিন্দি *বৈতালপচ্চিসী*-তে একাধিক উত্তমপুরুষ এবং গল্পের ভেতরে গল্প উপস্থাপনার কৌশল অনুসৃত হয়েছে।

১০. দ্র. *ক্রীতদাসের হাসি;* শওকত ওসমান।

ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান অবশ্য তাঁর উপন্যাসটিতে একটি নতুনতর কৌশল অবলম্বন করেছেন। কাঠামো অভিন্ন রাখলেও *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসে সহস্র এক নয়, সহস্র দুই তিন রাত্রির কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। এজন্যেই তাঁর কাহিনী *আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা নয়,* আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে অর্থাৎ সহস্র দুই রাত্রি।

১১. দ্র. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার; 'আরব্যোপন্যাসের জগৎ ও রবীন্দ্রনাথ', *এবং মুশায়েরা,* আরব্য রজনী বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ৭৫-৭৯

প্রবন্ধটিতে আরব্যরজনীর কল্পলোকের সঙ্গে ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু বাস্তবতার সাদৃশ্য সন্ধান করা হয়েছে এবং 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে গল্পকার 'অসাধারণ দক্ষতায়' 'ম্যাজিক রিয়্যালিজ্‌ম্'-ই তৈরি করেছেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

১২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; *সাহিত্যে ছোটগল্প,* তৃতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬৯, পৃ. ৮৮

১৩. *টেমিং অব্ দ্য শ্রু*-র মুনীর চৌধুরী-কৃত অনুবাদ *মুখরা রমণী বশীকরণ*। অনুবাদক অবশ্য ক্রিস্টোফার স্লাই সংশ্লিষ্ট নাটকের প্রবেশক দৃশ্যটি বর্জন করেছেন।

১৪. বন্ধু হোরেশিয়র উদ্দেশে ব্যক্ত হ্যামলেট-এর সংলাপাংশ নিম্নরূপ :

'There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.'

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে মাশুল-কালেক্টর উপর্যুক্ত সংলাপাংশটি ঈষৎ পরিবর্তন করে এভাবে উচ্চারণ করেছেন : 'There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers.'